বাংলা কথা সাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ীর অবদান আলোচনা করো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ী একজন শক্তিমান ঔপন্যাসিক। সতীনাথ ভাদুড়ী জনপ্রিয় লেখক না হলেও সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের আলোচনা সতীনাথ ভাদুড়ীকে বাদ দিয়ে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাঁর উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ ও অন্যান্য রচনা সংকলনের সংখ্যা মাত্র চোদ্দ। স্বাধীনতা প্রাপ্তি মুহূর্তে যখন শরৎচন্দ্রীয় রোমান্টিকতার অবসান, কল্লোলীয় আবেগ বোহেমিয়ান ভাবালুতা ও স্বভাবের বিলুপ্তি, বিভূতিভূষণের প্রকৃতি মুগ্ধতার চিত্রে ভাটার টান, তখন এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যে সমস্ত কথাসাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সতীনাথ ভাদুড়ী। পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), দাঙ্গা (১৯৪৬), দেশবিভাগ (১৯৪৭), উদ্বাস্তু স্রোত (১৯৫১) প্রভৃতি ঘটনা শিল্পীকে উদ্বোধিত করেছিল, যা তাঁর কথাসাহিত্যে রূপ পেয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ী ভূমিসম্পর্ক জ্ঞানে, ভারতীয় গ্রাম সমাজ অধ্যয়নে তারাশঙ্করের উত্তরসূরি। তারাশঙ্করও সুবোধ ঘোষের মতোই। তিনি প্রথম আবির্ভাবেই চমক সৃষ্টি করেছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় কংগ্রেস কর্মীরূপে তিন বার কারাবরণও করেছিলেন। বনফুলের মতোই উত্তর-বিহারের এক খণ্ড অঞ্চলকে লেখক তাঁর সমস্ত
উপন্যাসের ঘটনাভূমি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। অসহায়, নিঃসঙ্গ অথচ গতিশীল গ্রাম্য বিহারী মানুষের জীবনকথাকে সাহিত্যরূপ দিয়েছেন উপন্যাসে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

"সতীনাথই বোধ করি শেষ মননদীপ্ত লেখক যিনি কলকাতা এবং কলকাতাইয়া মধ্যবিত্তকে তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার করেন নি। অথচ সব দিক দিয়ে তিনি আধুনিকেরও আধুনিক।"

সতীনাথ ভাদুড়ী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন না। একমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারাই ব্যক্তির জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, একথার উপরেই সতীনাথ জোর দেননি, তার মানে তিনি অর্থনৈতিক অবস্থাকে অগ্রাহ্য করেন নি। তবে তাকেই একমাত্র নিরিখ বলে ধরেননি। মনোগহনের জটিল আঁধার পথের চোরা গলিতে তিনি সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রথম ও বিখ্যাত উপন্যাস 'জাগরী' ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে 'জাগরী' ১৯৫০ সালে খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত ও পুরস্কৃত হয়। তবু তা সতীনাথের শিল্পশক্তির সর্বোত্তম প্রকাশ নয়। কারণ 'জাগরী' রোমান্টিকতা, আদর্শ ও ভাবাবেগ বর্জিত নয়। 'জাগরী'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক বলেছিলেন, "রাজনৈতিক জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই আলোড়নের তরঙ্গ বিক্ষোভ কোনো কোনো স্থলে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিকেও আঘাত করিতেছে। এইরূপ একটি পরিবারের কাহিনী।"

বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস ধারায় 'জাগরী' উপন্যাসের স্থান সর্বাগ্রে। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ লেখকের সতর্ক রাজনৈতিক দৃষ্টি ও অকপট জীবনদৃষ্টি। 'ধাত্রীদেবতা'র যেখানে শেষ বলা যায়, 'জাগরী'র সেখানে শুরু। যে পারিবারিক বিখণ্ডন ছিল চরিত্র পাত্রদের ব্যক্তিত্বের জন্যই অবশ্যম্ভাবী—যে প্রজন্ম-ব্যবধান ছিল ইতিহাসের নিজ নিয়মেই অনিবার্য, ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক মুক্তি সংগ্রামের শেষ অঙ্কে রাজনৈতিক মতাদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে সেই অবশ্যম্ভাবিতা ও অনিবার্যতা কোন্ উদ্বেগময় আবর্ত সঙ্কুলতা সৃষ্টি করল, উপন্যাসে সেটা 'জাগরী'র বিখ্যাত কথন-শৈলী মারফৎ মূর্ত। লেখকের কৃতিত্ব এই যে, যথাসম্ভব নিরাসক্তির সঙ্গে তিনি সেই বিখণ্ডন ও ব্যবধানের দায়-দায়িত্ব সকলের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। সে বিচারেই বলা যায়, এ উপন্যাসের নায়ক 'জাগরী', জাগ্রত ভারতবর্ষ—বিলু–নীলু উপলক্ষ মাত্র। পরাধীন ভারতবর্ষের শেষ প্রধান উপন্যাস 'জাগরী'—আমাদের পরিবার কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের কারুণ্য ও সঙ্কটের ভেতর দিয়ে নতুন কালের আদর্শগত সমস্যার প্রথম পদধ্বনিও এই উপন্যাসেই শোনা গেল প্রথম।

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (প্রথম খণ্ড ১৩৫৬ ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়) সতীনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'তাম্মা' জাতিদের জীবন চিত্রণের মাধ্যমে বিহারের গ্রাম জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি লেখক এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। স্বয়ং লেখকের মতে 'জাগরী' নয়, 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। লেখকের কথায়—

"ঢোঁড়াই চরিত মানস সরোবরের ন্যায় বিশাল ও গভীর। সেইটাকে চেয়েছিলাম এক গণ্ডূষ গল্পের মধ্যে ধরতে, পারিনি। এক সময় ভেবেছিলাম যতকাল বাঁচব ঢোঁড়াইদের মনের পরিবর্তনের রূপরেখা এঁকে যাব। .....তাম্মা টুলিতে ঢোঁড়াই নামের একজন লোক সত্যিই ছিল। সে এক বছর আগে স্বর্গে গিয়েছে। এখানকার গ্রামাঞ্চলে ও নামটা খুব চলে। তবে তার হিন্দিতে বানান হল ঢ়োঢ়াই, উচ্চারণ চোড়হাই।"

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর উপন্যাস। তুলসীদাসের রামায়ণের মতো এই উপন্যাসের বিন্যাস। এ উপন্যাসের পরিধি বাংলার অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত জীবনের মধ্যে আটকে নেই। এর জগৎ বিহারের অন্ত্যজ ধাঙড় তাম্মাদের নিয়ে। সতীনাথ সত্যিই লেখকের লেখক। সতীনাথ ভাদুড়ীর শেষ পর্যায়ের উপন্যাস ত্রয়ী ['অচিন রাগিণী' (১৯৫৪), 'সংকট' (১৯৫৭) এবং 'দিগ্‌ভ্রান্ত' (১৯৬৬)] যথার্থ আধুনিক উপন্যাস হিসাবে উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি উপন্যাসের নাম তাৎপর্যপূর্ণ ও সংকেতময়। এই উপন্যাসগুলিতে তিনি পরিচিত জীবনের কাহিনি কিংবা অভ্যস্তপথে চরিত্র সৃষ্টি করেন নি। তিনি এতে যা লিখেছেন তার থেকে অনেক বেশি আভাসিত হয়েছে। আধুনিক উপন্যাসের সবকটি লক্ষণই এই তিনটি উপন্যাসে পাওয়া যায়। চেতনালোক থেকে অবচেতন লোকে চরিত্রের নিঃসঙ্গ যাত্রা, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও বিষাদে আক্রান্ত চরিত্রের স্বীকারোক্তি, অন্তঃসংলাপ, আপাত শিথিল মুহূর্তের সমাহারে অখণ্ড জীবনবোধ, আধুনিক জীবনের ভিতরের রোগ নির্ণয় ও বিশ্লেষণ প্রভৃতি এক নতুন শিল্পরূপ লক্ষ করা যায় সতীনাথের এই উপন্যাসগুলিতে।

তাছাড়া তিনি শিল্পকৌশলকে তিনটি উপন্যাসে এমনভাবে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন যে তা ধরাই যায় না। 'অচিন রাগিণী' উপন্যাসে এক নতুন মানসিক সম্পর্ক, মান-অভিমান, আঘাত-আকর্ষণের ছবি এঁকেছেন।'সংকট' উপন্যাসেও শিল্পরীতি প্রশংসনীয়। এই উপন্যাসের বিশ্বাসজি হঠাৎ একদিন রাজনৈতিক জীবন, বাইরের কর্মজগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। সবাই অবাক হল,কিন্তু বিশ্বাসজি আর জনসেবার কাজে, দলের ফিরে গেলেন না। বিশ্বাসজির কাজে আত্মানুসন্ধানের কাহিনিই হল 'সংকট'। কয়েকটি নির্বাচিত মুহূর্তের ছবি ও তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, কয়েকটি মানুষের মনের অন্ধকার চোরাগলিতে সন্ধানী আলো নিক্ষেপ—এসব দিক থেকে উপন্যাসটির গুরুত্ব যথেষ্ট। বলাবাহুল্য লেখক আধুনিক মানুষের আত্মানুসন্ধানের কাহিনিকে রূপদান করেছেন 'সংকট' উপন্যাসে।
'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৩৫৬ সালে। তার আগে 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। এটি একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। বিহারের কাটিহার জুটমিলের ধর্মঘটের সময় শ্রমিক-শোষণের করুণ অভিজ্ঞতা লেখককে এই উপন্যাস রচনায় প্রেরণা দেয়। সতীনাথ ভাদুড়ীর শেষ উপন্যাস 'দিগ্‌ভ্রান্ত'— আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ ও নিঃসঙ্গতার কাহিনি। বিষাদ ও নৈরাশ্য থেকে সংঘাতপ্রাপ্তি ও আশার প্রত্যাবর্তনের কাহিনি। "দিগ্‌ভ্রান্ত'-এর মত পারিবারিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে নেই।

সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসের চরিত্রগুলির আদর্শ, নিষ্ঠা, ত্যাগ স্বীকার, উচ্ছ্বাস, ভাবপ্রবণতা, ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনা, সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বিভিন্ন পটভূমিতে শিল্পরূপ পেয়েছে। সমস্ত চরিত্রগুলিই আত্মবিশ্লেষণে পাঠকের কাছে প্রত্যক্ষ, জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এর মূলে আছে লেখকের সীমাহীন দরদ, নিপুণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও নির্মম নিরপেক্ষতা, তাছাড়া চেতনা প্রবাহ রীতির যে সার্থক প্রয়োগ এই উপন্যাসে লক্ষ করা যায় তা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা উপন্যাসে বিরল।